অনন্তযাত্রা

মানবেন্দু রায়

মধ্যরাত্রির মানচিত্র পার হয়ে সময় এখন আরেকটি উষার দিকে পলে পলে এগিয়ে চলেছে। আকাশের রঙ কালচে নীল। আদিগন্তে কোথাও একখন্ডসাদা মেঘ নেই। দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানার সারি সারি দশটি চিমনী এক্ষণে স্থির চিত্রের মতো আকাশের দেয়ালে পিঠ রেখে দাঁড়িয়ে আছে। উদ্ধত এবং নিষ্প্রাণ। এই দশটি চিমনী স্টীল মেল্টিং শপের। তারও পিছনে আরো কয়টি চিমনীর শিরোদেশ ঈষৎ দেখা যাচ্ছে। ঐগুলি কোকওভেন অঞ্চলের স্টীল মেল্টিং শপের চিমনীযুথের পিছনে পাশাপাশি চারটি ব্লাস্ট ফার্নেসের চূড়া। চূড়ার উপরে আগুনের কোলাহল কিংবা সামান্য ধুম্রচিহ্ন নেই। স্টীল মেল্টিং শপের পশ্চিম দিকের শেষ দুটি চিমনীর মুখ দিয়ে বাদামী বর্ণের ধূঁয়ো আস্তেআস্তে বের হচ্ছে। তা এত ধীরে যে হঠাৎ দেখলে মনে হবে, কালচে নীল ক্যানভাসের উপর হালকা বাদামী রঙের ব্রাশের টান স্থির হয়ে ছড়িয়ে আছে। বোধ হয় এমন অবস্থাকে এক কথায় চিত্রার্পিত বলা হয়।
টাওয়ার লাইটের নীলাভ আলোয় শেষ রাত্রির আকাশে কোন অন্ধকার নাই। বস্তুত দূর থেকে দেখলে কারখানাকে তামস রাত্রির গভীর সমুদ্রে একখন্ড আলোকিত দ্বীপপুঞ্জ বলে ভ্রম হয়। আলো এবং যন্ত্র --- সভ্যতাকে প্রসারিত করে। যদিও আমরা জানি, সভ্যতার হাঁটুর নীচটিতে সবচেয়ে বেশি গহন অন্ধত্ব স্তূপাকৃত, গোপন রহস্যের মত জমে থাকে। অনির্ণেয় বেদনার মত যে অন্ধত্ব উদাসীন এবং ভাষাহীন। ইতিহাস শুধুমাত্র আলোকের উজ্জ্বলতাকে অনুসরণ করে, একদা আলোকিত অথচ মৃত মুখোশগুলিকে মাটি খুঁড়ে বের করে, কিন্তু অন্ধকারের প্রতি তার কোন দায় নাই, সেই অবজ্ঞাত বেদনাসমূহকে স্পর্শ করার প্রবণতাও নাই।

পাঠক, এই উপাখ্যান সর্বতোভাবে অন্ধকারের, অতএব ইহা অনৈতিহাসিক। কেননা সামাজিক বাবুসমাজ এই অন্ধকার থেকে যোজন যোজন দূরত্বে বাস করেন, তাই এই রচনায় আমি শুধু সেই অশ্রুত বেদনাকে স্পর্শ করার চেষ্টা করেছি মাত্র।

একটু পরে ঘুম ভাঙবে স্টীল প্ল্যান্টের। ঘুম ভাঙার প্রাক মুহূর্তে একজন মানুষ যেমন নিঃসাড় ওম জড়িয়ে গভীর তন্দ্রায় ডুবে থাকে, ঠিক তেমনি স্টীল প্ল্যান্টও এক নিঝুম হয়ে নিশ্চল পাহাড়ের মত স্থির। বুনো কাশ আর শরবনের সবুজ পাতায় পাতায় হেমন্তের শেষ রাতের বিন্দু বিন্দু শিশির জমে উঠেছে। স্টীল প্ল্যান্টের জনশূন্য নির্জন রাস্তা দিয়ে একটা গাড়ী (হয়ত মাহিন্দ্র অ্যান্ডমাহিন্দ্র কোম্পানীর জিপ অথবা স্ল্যাগ কিংস্বা বালি ভর্তি ডাম্পার।) দ্রুতগতিতে চলে যাওয়ার সাথে সাথে পিছনে ফেলে রেখে যাচ্ছে ডিজেল পোড়ার কটু ঘ্রাণ সহ কালোধূলোর একটিশীর্ণ বত্ররেখা। শেডে শেডে দু'একজনের গলার আওয়াজ, কথার টুকরো ভেসে ভেসে আসছে। সূর্য ওঠার পনের মিনিট আগে তারস্বরে বাজতে শু করবে সাইরেন। একে একে কারখানার দুটি গেট দিয়ে পর পর ঢুকতে শু করবেমনিং শীফ্টের ক্রীম ও নেভী ব্লু রঙের বাসগুলি। মানুষ জনের চলাফেরায়, ভারি সেফটি বুটের ট্রলপ ট্রলপ শব্দে ঘুম ভাঙবে সারারাত নিঃসাড় হয়ে পড়ে থাকা ছোট বড় রাস্তাগুলির। দু'নম্বর গেটের ডানদিকে তামলা ব্রীজের একপাশে রাধাচূড়া আর শিরীশ গাছের সবুজাভ চূড়ার উপর স্প্রীঙের মত লাফ দিয়ে উঠে আসবে পুরনো বুড়ো লাল সূর্য। ঘুম ভাঙছে স্টীল প্ল্যান্টের।
কারখানাকে যদি একটা মানুষের শরীর বলে ভেবে নেওয়া যায়, তাহলে তার এক একটা গেট হচ্ছে একটা একটা মুখের মত। কোনটার সাথে কোনটার মিল নাই। আর প্রতিটি গেটের সামনে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রসত্তার এক একটি পৃথিবী। এই পৃথিবীতে যারা বাস করে তারা কারখানার কেউ নয়---কিন্তু তাদের না হলে কারখানার একটি দিনও চলে না। এরা ভাঙা শেড মেরামত করে---- নতুন শেড বানায়---- বাতিল ব্লাস্ট ফার্নেসের পেটের নোংরা সাফ করে, ফের নতুন করে ফায়ার ব্রীকস্ গাঁথে, কোকচুল্লির ব্যাটারি সাটডাউন হলে তারা তাকে ভাঙে এবং ফের নতুন করে বানায়। ওয়াগন থেকে সাইডিং জুড়ে থরে থরে সাজিয়ে রাখে ---কয়লা, কোক, চুনাপাথর, ম্যাগাজিন -ওর, বক্সাইট, লৌহ আকরিক, মাগ্যানাসাইট, ফ্যারো - সিলিকন আর ফ্যারো - ম্যাঙ্গানিজ। কারখানার গেটগুলির আশে পাশে প্রাগৈতিহাসিক গুহাসদৃশ ঝুপড়িগুলিতে এরা থাকে।
ভোর। প্রথামাফিক এই ঝুপড়ি সাম্রাজ্যের ঘুম ভাঙছে প্রতিদিন কারখানার জেগে ওঠার সাথে সাথে।

এ্যালয় স্টীল প্ল্যান্টের সামনে দাঁড়িয়ে পশ্চিম দিকে তাকালে দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানা দু' নম্বর গেটের সামনে ঘুমিয়ে থাকা ঝুপড়ি সাম্রাজ্যকে দেখলে, দূর হতে মনে হয় সার্কাসের তাঁবুর মত। সামনে থেকে নিচু হওয়া চালাগুলি ক্রমশঃ উঁচু হ'তে হ'তে ফের পিছন দিকে নিচু হয়ে তামলা খালের দিকে নেমে গেছে।

তামলা খাল, কেউ কেউ তাকে নদী বলে ডাকলেও বর্ষা ছাড়া অন্য ঋতুতে সে প্রকৃতই শীর্ণা, তখন তাকে একটা বড় আকৃতির নর্দমা ছাড়া অন্য কিছু ভাবা যায় না কারখানার বর্জ্য পদার্থ নিষ্কাশণের ড্রেন দিয়ে গড়িয়ে আসা ডিজেল আর মোবিল মিশ্রিত তৈলাক্ত কালো জল সারা বছর শব্দহীন প্রবাহিত হয়। স্বচ্ছতাহীন সেই জলে যন্ত্র সভ্যতার যাবতীয় ক্লেদ অবলীলায় ভেসে যায়। তামলা খালে দুই পাশ নিষ্পাদপ প্রায়, কেবল একটি দুটি গ্ন শিশুগাছ কোন প্রতীক্ষা ছাড়া উদাসীন দাঁড়িয়ে থাকে। তাদের সবুজ পাতাগুলি কোনদিন হরিৎবর্ণ ছিল না, জন্মকাল থেকে তারা কারখানার পাখাওয়ালা ভস্মাবশেষ আর কৃষ্ণবর্ণ ধূলায় ম্রিয়মান। এই সব বৃক্ষে কোন পক্ষী পরিবার বাস করে না। সেখানে প্রভাতকালীন পাখিদের কল - কাকলি নেই। অন্ধকারে ডুবে থাকা এই ঝুপড়ি বিশ্বের নিদ্রিত প্রাণকণাদের ঘুম, সুতরাং এখানে কোনদিন পাখির ডাকে ভাঙে না।

দু'নম্বর গেট থেকে কালো অজগরের মতো রাস্তাটা প্ল্যান্ট থেকে বের হয়ে একটা মোচড় দিয়ে বেঁকে গিয়েমিলেছে এ্যালয় স্টীল প্ল্যান্টের সামনের রাস্তায়। এই রাস্তাটা দক্ষিণ দিকে মাইলখানেক এগিয়ে দুভাগ হয়েছে। একটা ভাগ রেল ক্রশিং পার হয়ে গিয়ে মায়াবাজারের পাশ কাটিয়ে সোজা পাড়ি দিয়েছে দুর্গাপুর থারমাল পাওয়ারস্টেশনের কারখানার দিকে। অন্য ভাগটা কারখানার লম্বা দেওয়ালের পাশ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে সোজা গিয়ে শেষ হয়েছে ওয়ারিয়া রেলওয়ে স্টেশনে। স্টেশনের সামনে স্টীল প্ল্যান্টের তিন নম্বর গেট। গেটের সামনে ইতস্তত ছড়ানো ছেটানো ঝুপড়ি দোকান, পান গুমটি--- খানিকটা এগিয়ে গেলে গুটিকয় রেলওয়ে কোয়াটার --- যাদের আভিজাত্য লীন হয়ে গেছে কারখানার দেওয়াল ঘেঁষে কয়েকশো ঝুপড়িপট্টির কালো চারকোল দিয়ে আঁকা বাস্তবতার অভিঘাতে। এখানে আর কোন রাস্তা নেই। অবশ্য কালো ধূলো আর কয়লাগুঁড়ির নিচে যে একদা রাস্তা ছিল তা বোঝা যায় সহজে। ঝুপড়ির আঁকা বাঁকা রাস্তা ভাঁজ পেরিয়ে, কয়লার গুঁড়ো জমা জলের অগভীর চৌবাচ্চার পাশ দিয়ে আর একটা রেল ফটক পার হয়ে এই প্রায় - লুপ্ত পথ শেষ হয়েছে দেড়দশক আগের জমজমাট--- বর্তমানে হতশ্রী নয়া বাজারে। একপাশে পাহাড়ের অহমিকা নিয়ে দিন দিন উঁচু হচ্ছে স্ল্যাগ - ব্যাঙ্কের চূড়া। যেখানে লৌহমলের বর্জ্য স্তূপের ছায়ার নীচে ঘাড় গুঁজে ঝিমিয়ে থাকে ওয়ারিয়া আর গোশালা--- গ্রাম দুটি।

রেলপথের উঁচু পাড়ের উপর দাঁড়িয়ে আরও দক্ষিণে দৃষ্টি পাঠালে দেখা যায় দামোদর নদের উপর কারখানার রিজার্ভার, আর সেই জল বাঁধের অন্যপাশে অনেক দূর আকাশের গায়ে লেপ্টে দাঁড়িয়ে আছে অস্পষ্ট নীলাভ শুশুনিয়া পাহাড়ের স্তূপাকার দেহরেখা। মনে হয়, বুঝি পৃথিবী ঐখানে শেষ হয়ে গেছে। এটা পাকা সড়কের দক্ষিণ দিক।

আর উত্তর দিকে পাকা সড়কের ল্যাজের অন্য প্রান্ত তামলা খালের উপর ব্রীজ টপকে তামলা বস্তির কয়লা ডিপোগুলির পাশ কাটিয়ে, বাঁ পাশে ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট আর ফরিদপুর গ্রাম আর ডানদিকে পলাশডিহা মৌজা ছাড়িয়ে গিয়ে মিলেছে গান্ধীমোড়ের চৌরাস্তার শাহী সড়কে।

শাহী শড়ক, যা এক্ষণে গ্রানড ট্রাঙ্ক রোড, পশ্চিমে সে অন্ডাল --- রাণীগঞ্জ মোড় পার হয়ে পাড়ি দিয়েছে আসানসোলের দিকে আর পূর্বে সে পথ বর্ধমান শহর ছুঁয়ে চলে গেছে রাজধানী শহরে। এই গান্ধী মোড় থেকেই উত্তর দিকে সোজা এগিয়ে গেছে চৌরাস্তার একটি প্রান্ত। দুপাসের কৃষ্ণচূড়া আর রাধাচূড়ার সবুজ ছায়ায় চলতে চলতে সেই রাস্তা গিয়ে পৌঁছেছে স্টীল টাউন শীপে, ইস্পাত প্রকল্পের উপনগরীতে। ঝুপড়ি বিশ্বের বাসিন্দাদের কাছে সে এক অজানা আশর্চ্য জগৎ ---তারা বলে টৌনশীপ---যেখানে কারখানার বাবুভাইয়ারা থাকে। সরকারের বাস যাদের প্রতিদিন কারখানায় আদর করে নিয়ে আসে, কাজ শেষে আবার পৌঁছে দেয় শীফ্টর শেষে টৌনশীপের কোয়াটারেকোয়াটারে। ঝুপড়ি বিশ্বের বাসিন্দারা আরও জানে---- বাবুভাইয়ারা লিখাপড়া জানা আদমি। কারখানার ইমানদার সাহেবলোগ এবং সরকার তাদের জন্যই এই কারখানা বানিয়েছে।

দু'নম্বর গেটের ঝুপড়ি ঝিকে স্থানীয় বাসিন্দারা বলে ছাইগাদা বস্তি। প্রকৃত পক্ষে এই ঝুপড়ি সমূহের কোনটির নীচে বিন্দুমাত্র মাটি নাই। কারখানার পাওয়ার প্ল্যান্টের অঙ্গার ও ভস্মাবশেষ আর পোড়া কয়লার গুঁড়োর উপর গজিয়ে উঠেছে এই ঝোপড়াগুলি। মাটি না থাকলেও এখানে ভূমির অবস্থান উচ্চাবতল।

ঝুপড়িগুলির শুতে কয়েকটি দোকান। বাঁ দিকে একপাশে ব্যানার্জীর ভাতের হোটেল। গন্ধবহ জর্দা আরপানের রসে সিক্ত দুটি ঠোঁট ব্যানার্জীর ---তার হোটেলটির রন্ধনশিল্পী, পরিবেশক এবং মালিক তিনটি ভূমিকাতে সেমানানসই। অবশ্য মাঝে মাঝে ঝোপড়ার মাঝি মুন্ডা লেবারদের লোন্ডাবাচ্ছারা ব্যানাজীর হোটেলের বাসনপত্র ধোয়ার কাজে লাগে, সে নিছক পেট ভরে ভাত খাওয়ার বিনিময়ে। দু'একদিন পর হলে নিয়ম মত তারা ভেগে যায় এবং আবার নতুন কোন লোন্ডহাজির হয়। কেউ না জুটলে মাঝে মাঝে নাচার ব্যানার্জীকে খদ্দেরদের এঁটো তুলতে হয়,বাসন মাজতে হয়। বাঁকে করে টিন ভর্তি জল আনতে হয় কারখানার দেওয়ালের এক পাশে কল থেকে।

ব্যানার্জীর হোটেলের পাশে মুকুন্দ সিংহের পানের গুমটি দোকান। পুলিয়া জেলার বাসিন্দা মুকুন্দ একদা বৌকে নিয়ে মজুর হয়ে ঢুকেছিল কারখানায়। কয়েক বছরের মধ্যে আশপাশের গাঁ থেকে লোকজন আর নিজের ভাই - বেরাদরদের জুটিয়ে এনে এখন সে মুকুন্দ সর্দার। একটা আস্ত লেবার গ্যাঙের মালিক। তার বৌ এখন ঝোড়া টানা মজুরানী নয়, দলের লোকজন ছাড়াও ঝোপড়ার পাশাপাশি বাসিন্দা মুকুন্দ সিংহের অউরাতকে ---'সর্দরীন' সম্বোধনে ডাকে। লেবারদের কারখানার পেটের ভেতর ঢুকিয়ে দেওয়ার পর সারাদিন মুকুন্দের অঢেল সময়, সময়টা ব্যবহার করার জন্য সে এই পানের গুমটি দোকান খুলেছে। ব্যবসা, লেবার কমিশন ছাড়াও মুকুন্দের আর একটি গোপন আয় সূত্র রয়েছে। দশটাকায় দু-টাকা হারে সুদ নিয়ে লেবারদের টাকা ধার দেয় --- টাকা দেওয়ার সময় সে সুদের দন আগাম পাওনা কেটে রাখে অর্থাৎ দশ টাকা ঋণ নিতে হলে কর্জদার হাতে সাপ্তাহিক দু'টাকা সুদ বাদ দিয়ে নগদ আট টাকা দেয়। সপ্তাহ শেষে হাজিরার মাইনে থেকে মুকুন্দ মূল দশ টাকা আদায় করে নেয়।

মুকুন্দ সুদের ব্যবসা করে হপ্তা হিসাবে, শোধ বোধ হপ্তাতেই শেষ। একটা হিসেব শেষ করে জরত হলে ফের ধান নাও--- কিন্তু লেবারদের উধারের জের হপ্তা গড়িয়ে মাসের দিকে নিয়ে যেতে মুকুন্দ নারাজ। এই গোপন বাণিজ্য সম্পর্কে কারখানার কোন সুপারভাইজার প্রশ্ন করলে মুকুন্দ বলে--- ঘোষ বাবু, ও সব মিছা কতা। হামি উসব নাদান কাম করলি কুনদিন। পুছো হামার লোকদের।

তারপর পান গুমটির সামনে দাঁড়িয়ে থাকা কোন মজুরকে সাক্ষী মানে--- হঁরে ডোমন তু বল দিকিনি ঘোষবাবুকে --- হামি সুদের ব্যবসা করলি তুদের কাছে? সাচা বাতা?

মুকুন্দ সিংয়র পান গুমটির পাশে বংশী ঘোষের চা পকৌড়ির দোকান। বংশীর চায়ের দোকানের বাঁ দিকে সুধীর সাউয়ের হোটেল, এখানে সুধীর সাউয়ের ঝোপড়া দোকানটি সবচেয়ে বড়।। তার পণ্যতালিকাও বিস্তৃত - ভাত, ডাল, সবজি, মাছলি, মান্‌সো, চায় দুধ, বুঁদিয়া সেউ, বালুসাই, লাড্ডু, বাংলা মদ, বীয়ার অর্থাৎ তামসিক রাজসিক সমস্ত খাদ্যদ্রব্যই সুধীর সাউ খদ্দেরকে যোগান দিতে পারে। সুধীর সাউয়ের নামে দোকান হলেও এ দোকানেরর আসল মালিক তার বাপ বৃন্দাবন সাহু। অবশ্য বৃন্দাবনকে কচিৎ দেখা যায় দোকানে এবং নামে সুধীরের হলেও দোকান চালায় মূলত দুজন--- সুধীরের মা লাজবন্তী এবং নোকর রবিয়া।

বাঁকুড়া জেলার পুখন্যার যাদব সন্তান রবিলোচন ঘোষকে বাঙলী বলে চেনাই দুষ্কর, হিন্দিভাষীদের সংসর্গে সে রবিয়ায় পরিণত হয়েছে --- দোকানের বেশির ভাগ খদ্দের তাকেই মালিক বলে চেনে। দোকানে খানিক সময় পার করলে বোঝা যায় সুধীর সাউও ব্যবসা চালাতে পুরোপুরি রবিয়ার মুখাপেক্ষী।

মুকুন্দ সিংহের পানগুমটি আর বংশী ঘোষের ঝোপড়া দোকানের মাঝখানে একটি অপরিসর গলি। এই গলি দিয়ে লেবার ক্যাম্পের ভিতর পৌঁছানো যায়। প্রথমেই টুমি সর্দারের কুর্মী লেবারদের ঝোপড়া। এ জায়গাটা তাঁবুর মাথার মত উঁচু। একদা কুর্মীদের সর্দার ছিল ছত্রধারী মন্ডল। কালত্রমে সে দল টুনি সর্দারের দখলে এসেছে। ছাউগাদা বস্তির লেবারদের মধ্যে কুর্মীরা সব চেয়ে চতুর, পরিশ্রমী এবং ফিকিরবাজ। মেহন্নতের কামাই তারা সহজে বাজে পথে খরচ করে না, উপরন্তু কারখানার হপ্তা মজুরী ছাড়াও নানা ধান্দায় টাকা কামানোর চেষ্টা চালায় এবং সফলতা অর্জনও করে।

টুনি সর্দারের ঝোপড়া পার হলেই গোবিন্দ, টুনু, গুচরণ, লখিন্দর, উদয়, রাম সিং, পরধান, ভোঁদা, সুচাঁদ, লক্ষী, সাবিত্রী, ঘল্টু মাহাতো এমন স্ব লেবারদের ঝোপড়া। এদের সর্দার শিবচরণ এবং সনু মুন্ডা। শিবচরণ এবং সনু দু'ভাই ---দুজনই বিপরীত চরিত্রের। শিবচরণ স্থির, শীর্ণ এবং নরম স্বভাবের, অন্যদিকে সানু দুর্দান্ত এবং ঢ়। শক্ত সমর্থ চেহারা তার মুখে কাঠিন্য সহ একটি হিংস্র আবরণ তৈরী করেছে। পাকানো কালো গোঁফ এবং রক্তাভ চক্ষু দুটি মুন্ডার চরিত্রকে বিশেষ সহজে স্পষ্ট করে দেয়।

শিবচরণ এবং সনু মুন্ডার দলের লোকেরা আদিবাসী। বিহারের ছোটনাগপুর, উড়িষ্যার কেওনঝোর ও ময়ুরভঞ্জ এবং পশ্চিমবঙ্গের পুলিয়া জেলার সাঁওতাল এবং মুন্ডা সমাজ থেকে এরা কারখানার মজুর হয়ে এসেছে। এরা সকলেই ফাস্ট জেনারেশন ওয়ার্কিং ক্লাস --- এদের পূর্বপুষেরা মূলতঃ গ্রামীণ এবং কৃষিজাতক ছিল। আয়ের সূত্র কারখানার সঙ্গে জড়িয়ে গেলেও এদের অনেকেই এখনো চাষের সময় দেশে যায়, শস্য কর্তনের দিনগুলিতে গ্রামীণ আকাশের নিচে অনায়াসে কয়েকটি দিন কাটিয়ে দিতে পারে। অবশ্য গুচরণ, লখিন্দরদের মত কেউ কেউ আছে যাদের গ্রামীণ শিকড় প্রায় ছিঁড়ে এসেছে। দেশ বলতে তাদের চোখে এখন স্মৃতির ছিন্ন অংশ ছাড়া বেশি কিছু অবশিষ্ট নেই।

আধিবাসীদের ঝুপড়ির সঙ্গে গাঁ লাগিয়ে দাঁড়িয়ে আছে মুকুন্দ সিংয়ের লোকজনদের আস্তানাগুলি। এই সব ঝুপড়িবাসীদের ঘুম ভাঙে কারখানার ঘুম ভাঙার অনেক আগে। ঘরদোর পরিষ্কার করে একা উনুনে আগুন দেয়। সারারাতের নিঃসাড়তা কাটিয়ে ছাইগাদা বস্তিতে প্রাণ জেগে ওঠে। ঝোপড়ার ভিতর থেকে পোড়া কয়লার ধোঁয়া দ্রুত ছাইগাদা বস্তির ঝিমঝরা আকাশের দিকে পাক খেতে খেতে উড়ে যায়। সকাল সাতটায়, জেনারেল শীফ্টের নেভী ব্লু রঙের বাসগুলি একে একে কারখানার হাঁ মুখে ঢুকে পড়ার পরই সারা পাড়ায় ত্রস্ত ব্যস্ততা ছড়িয়ে পড়ে। শুরুহয়ে যায় মুকুন্দ শিবচরণ, সনু সর্দারের ত্রমান্বয়ে ডাকাডাকি।

মুকুন্দ সর্দারের হাঁক শোনা যায়--- এ - লিলকমল টুকুন জলদি কর। আর দেরি করলি তো গেট বন্ধহয়ে গেলি।

---গুচরণ ভেইয়া চলা গিয়া? গুচরণের বৌ বিজুলীকে জিজ্ঞেসা করে শিবচরণ সর্দার।

---ক্যায়া বে লখিন্দিরিয়া। কাল তো নাঙা ভইলি। দাপিকে শালা কাম বন্ধ কর দিলি। আজ ভি ছুটি করেগা--- না ক্যয়া রে ভেঁসড়ি? লখিন্দর মুন্ডার ঝোপড়ির সামনে তারস্বরে চেঁচাতে থাকে সানু সর্দার।
জোয়ান মরদেরা কাঁধে বেলচা, কোমরের বটুয়াতে খৈনি আর গেট পাশ নিয়ে, অন্যহাতে টিফিন বাক্স ঝুলিয়ে মাথা নিচু করে ঝোপড়া থেকে বেরিয়ে আসে। মেয়ে মজুরেরা দুটি ঝোড়াকে পর পর রেখে তার উপর ভাত ভর্তি বাটি গামছা ঢাকা দিয়ে অতি যত্নে সাজিয়ে নেয়। মুকুন্দ সিং আর বংশীর দোকানের অপরিসর গলির ভিতর দিয়ে তারা একে একে গর্তের বাইরে বেরিয়ে আসে। মরদেরা কেউ কেউ কোন একটি ঝোপড়া দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে ছোট্ট কাঁচের গ্লাসে দ্রুত চুমুকে, চা গিলতে থাকে। তারপর বটুয়া থেকে খৈনিপাতা এবং চুন বের করে তালুতে ডান হাতের বুড়ো আঙুল দিয়ে ডলতে শু করে। তৈরী তামাকচূর্ণে ঘনঘন তালি মারে। কেউ কেউ বিড়ি ধরায় তারপর ধুয়ো ছাড়তে ছাড়তে গেটের দিকে হাঁটা দেয়।
সমস্ত ঝুপড়ি জগতের শেষে তামলা খাল ঘেঁষে ভুঁইএঞা পাড়া। জীবনের এতো চঞ্চলতা, এতো ত্রস্ততা, জীবিকার মায়াবী টান ভুঁইএঞাদের কদাচিৎ স্পর্শ করে না। নীচু ঝোপড়ার চালায় পচা ঘাসের আচ্ছাদন থেকে টপটপ শিশির ঝরতে থাকে। অবনত দরজায় টিনের আগড়ের ফাঁক দিয়ে প্রভাত সূর্যের দেদীপ্যমান তমসা অপরাহক জ্যোতির্ময় আলো ভুঁইএঞাদের প্রায়ান্ধকার গুহায় প্রবেশ করতে পারে না। সুতরাং তাদের ঘুম ভাঙে না। বিগত রাত্রির মধ্যপানের হ্যাংওভার এবং জাগরণের (পেটে দানাপানি না পড়লেও ভুঁইএঞারা নানা উত্তেজনার খোঁজে অনেক রাত পর্যন্ত জাগতে পারে।) ফলস্বরূপ সাইরেনের তীক্ষ্ণ আওয়াজ ভুঁইএঞাদের ঘুম ভাঙাতে পারে না। আদিবাসী কর্মী প্রভৃতি মজুরদের মতো শেষরাতে উঠে চুল্লি জ্বালিয়ে ভাত রাঁধার ঐতিহ্য ভুঁইএঞাদের করতলগত নয়, সুতরাং তাদের এতো তাড়াতাড়ি ঘুম ভাঙার প্রয়োজন নেই। ভুঁইএঞারা অনেক রাতে ঘুমোয় এবং সবার শেষে তাদের ঘুম ভাঙে --- সুতরাং বেলচা আর ঝোড়া নিয়ে সবার শেষে একেবারে শেষ মুহূর্তে তারা কোনরকমে গেটে পৌঁছায়।

নক্ষত্র অথবা গ্রহ না বলা গেলেও রাধামাধব ধরকে উপগ্রহ বলা যেতে পারে। কেননা এই একটি মাত্র লোক সারাদিন পায়ে হেঁটে কারখানাকে ,কর্মসূত্রে প্রায় - প্রদক্ষিণ করতে বাধ্য হয়। তিন নম্বর গেটে ধরবাবুর যাত্রাবিন্দুর প্রাত্যহিক সূচনা। তিন নম্বর গেটে সাতটার মধ্যে লেবারদের ভেতরে যাওয়ার ব্যবস্থা শেষ করতে হাঁটতে হাঁটতে ঠিক সাড়ে সাতটার মধ্যে একটি স্যাটেলাইটের মত রাধামাধব দু'নম্বর গেটের সামনে এসে দাঁড়ায়।
পূরনো ঠিকাশ্রমিকদের অধিকাংশের চৌদ্দ নম্বর গেট পাশ। তাতে নাম ধাম সহ প্রত্যেকের পাশপোর্টেই সাদা কালো ছবি সাঁটা থাকে। চৌদ্দ নম্বর গেটপাশওলারা ধরবাবু আসার আগেই ভেতরে ঢুকে যায়।
ধরবাবু এসে দাঁড়ানো মাত্র পায়ে পায়ে টোকেন পাশধারী মজুরেরা গেটের পাশে এসে জড়ো হয়। প্রত্যেকের কাছে পেতলের গোল চাকতিতে নম্বর লেখা থাকে। সিকিউরিটি জোয়ান লিস্ট বের করে, ধরবাবুও নিজের ফাইলথেকে একটা বিবর্ণ তৈলাক্ত তালিকা বের করে একে একে নাম ধরে ডাকতে থাকে। সারি দিয়ে মজুরেরা একে একে সিকিউরিটির জোয়ানটিকে চাকতি দেখায়। জোয়ানটিও গভীর অভিনিবেশের সঙ্গে লিস্টের নামের সঙ্গে মজুরটিরমুখ মিলিয়ে দেখে সত্যের কাছে পৌঁছতে পায়। (যদিও তার সম্ভাবনা খুব কম। কেননা টোকেন পাশের দৌলতে ধরবাবু অনায়াসে রামের নামে যদুকে ভেতরে পাঠিয়ে দিতে পারে।) টোকেন পাশের শেষ লেবারটি ভেতরে চলে যাওয়ার পরই রাধামাধবের দৈনন্দিন হৃৎস্পন্দন শু হয়। ভুঁইএঞাদের এখনো গেটের আশেপাশে দেখা যাচ্ছে না। আটটা বাজবে, সঙ্গে সঙ্গে গেট বন্ধ হয়ে যাবে। ঠিক তার কয়েক মুহূর্ত আগে দেখা যায় ধীরে ধীরে বংশী ঘোষের দোকানের পাশ দিয়ে কালো পিপড়ের মত ভুঁইএঞারা একে একে বেরিয়ে আসছে। প্রতিদিন সবচেয়ে আগে বের হয় দেওলি ভুঁইএঞা ---জগদীশ সর্দারের বৌ। ঝোড়া মাথায় দেওলি খরপায়ে দ্রুত গেটের দিকে এগিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে রাধামাধব ধরের ময়লা ধুতি এবং হাফ শার্ট পরা ছোট্ট শরীরটিকে ঘিরে একটি সংশয়ের আবর্ত তৈরী হয়ে যায়।
সিকিউরিটি জোয়ানটি বারবার গেটের উপরের বড় ঘড়িটির সঞ্চরণশীল সেকেন্ডের কাঁটাটির দিকে তাকায়। তার দৃষ্টিপাত এবং ভুঁইএঞাদের সাড়হীন চলাফেরা ধরবাবুর হৃৎস্পন্দন আরও দ্রুত করে। সে গেট থেকে এক কদম সরে না যেন সরে গেলেই জোয়ানটি গেট বন্ধ করে দেবে! প্রায় প্রতিদিন ধরবাবু জোয়ানটিকে আধা হিন্দি এবং বাংলা মিশ্রিত ভাষায় প্রচুর অনুরোধ করে যদি আরও খানিকটা সময় গেটটি খুলে রাখা যায়। যদিও ধরবাবু জানে,তার সানুনয় অনুরোধ জোয়ানটির বধিরতাকে সামান্যতমও নাড়াতে পারবে না। মজুরদের নাম ধরে হাত নেড়ে নেড়ে রাধামাধব যতদূর সম্ভব গলা উঁচু করে হাঁকডাক শু করে।
গেটের একটি পাল্লা বন্ধ করার সঙ্গে সঙ্গে ভুঁইএঞাদের চেতনাহীন শরীরে জীবিতের স্পন্দন জেগে ওঠে। হঠাৎ যেন তারা টের পায়, গেট বন্ধ হয়ে গেলে আজকের অন্নসংস্থান বন্ধ। কেননা কারখানার কাজ জুটুক অথবা না জুটুক ক্যান্টিনের খাবার বন্ধ হলে সারাদিন উপবাসই কাটবে। ক্যানটিনের কাছে পৌঁছাতে হলে, কারখানার ভিতরে যাওয়া অতীব জরী। জোয়ানটিকে প্রায় ঠেলা দিয়ে বেশিরভাগ ভুঁইএঞারা ভেতরে ঢুকে গেলেও দু'একজন প্রতিদিন বাইরে আটকে যায়। তখন ধরবাবু গেট সংলগ্ন অফিসে গিয়ে অফিসারটিকে ইংরাজীতে অনুরোধ জানায়--- আটকে যাওয়া লেবার ক'টিকে ভেতরে ঢোকার অনুমতি দিতে।

আবেদনের সাথে বারবার বলে--- ভেরি পুওর ম্যান স্যার ভেরি পুওর। কাউন্ডলি পারমিট ফর এনট্রি অব দেম।
অফিসারটি নতুন হলেও ধরবাবুর বয়স এবং ইংরাজী ভাষার জন্য বাইরে বেরিয়ে এসে জোয়ানটিকে হুকুম দেয় লেবারক'টিকে মূল গেট গিয়ে ভেতরে আসার জন্য অনুমতি দিতে। পুরানো অফিসার হলে মৃদু আপত্তি জানিয়েও শেষ অবধি ধরবাবুর প্রার্থনা মঞ্জুর করে।
দেহাতি হিন্দি ভাষায় কুৎসিত গালি দিতে দিতে জোয়ানটি আটকে যাওয়া ক'জনকে ভেতরে আসতে দেয়। যারা এতোক্ষণ ভেতরে ঢুকে গিয়েছিল তারা নিশ্বাস বন্ধকরে সাগ্রহে গেটের দিকে তাকিয়ে ছিল। আটকে পড়া ভুঁইঞারা ভেতরে আসতেই সকলে একসঙ্গে হাঁটা দেয়।
ধরবাবু ভুঁইঞাদের উদ্দেশ্যে খসখসে গলায় শাসানি দিতে থাকে--- দেখো রোজ রোজ এইরকম নেহি চলে গা। কাল এমন হোগা তো হাম অফিসারকে থোড়া ভি রিখোয়েস্ট নেহি করে গা। ছোটবাবুকা পাশ কমপ্লেন করে গা, নেহি তো গেটপাশ ক্যানস্যাল করা দেগা। সমঝা....
ভুঁইঞা গাঙের প্রত্যেকে অসীম নিবিষ্টতায় ধর বাবুর কথা শোনে। তার বক্তব্য সমর্থন করে, ঘাড় নাড়ে দৃঢ় সম্মতিতে। লেবার সর্দার জগদীশ ভুঁইঞাও গম্ভীর মুখে ধরবাবুর দিকে তাকায়। তার অপরিষ্কৃত গোঁপের থেকে চায়ের বিন্দু ঝরে ঝরে পড়ে। তারা প্রত্যেকে কথা দেয় আগামীকাল থেকে এরকম আর হবে না।
কিশান এবং শুক্কুর ভুঁইঞা ধরবাবুকে বারবার বলতে থাকে--- ধরবাবু! চিন্তা মৎ করিয়ে। কাল সুবা সুবা সবদি আদমিকো খুব হামি পহেলা গেট পর হাজির করায়ে গা।
কিন্তু পরদিন আবার ভোর হয়। পুনরায় এক চিত্রের পুনরাবৃত্তি ঘটে। কেননা পরদিন প্রাতে প্রভাত কালীন সাইরেনের হৃৎকম্পনকারী শব্দে সমস্ত ছাইগাদা বস্তির জমাট ঘুম ভেঙে গেলেও ভুঁইঞাদের পাড়ায় সূর্য আলো দেয় অনেকটা সময় পরে। পরদিনও তাদের বিবশতা সঞ্চারী ঘুম যথারীতি ঠিক সময় ভাঙে না।

বিনির্মাণ ঃ১ / ১৯৭৪ সালের ৪ঠা নভেম্বর উপন্যাস লেখক তার জীবনে প্রথম ছাইগাদা বস্তির সামনে দু'নম্বর গেটে পা রাখে, র-মেটিরিয়াল ডিপার্টমেন্টের কন্ট্রাক্টর এম.এম.সিং এন্ড কোম্পানীর কোলএবং কোক সাইটের সুপারভাইজার হিসাবে যখন তিনমাসের জন্য এই কাজটি জোটে, তখন উপন্যাসকারের বয়স কুড়ি বছর। কিন্তু তার একনম্বর গেট পাশে রাধামাধব ধর লিখেছিলেন, জে--টুয়েনটি ওয়ান। কেন সে বয়স বাড়ানোর প্রয়োজন হয়েছিল সে সম্পর্কে কোন তথ্য এখনো উপন্যাস লেখকের কাছে নেই।
কারখানায় চাকরী জীবনের দু'চার দিনের মধ্যে বুঝতে পারা গিয়েছিল, ঠিকা মজুরদের জীবনে দিন ও রাত্রির কোন ছেদবিন্দু নেই। জুনিয়ার সুপারভাইজার হওয়ার জন্য সাইড পাওয়া যেত সব শেষে।ভাগ্যে জুটতো সবচেয়ে দূরের সাইট, সঙ্গে সবচেয়ে কুঁড়ে এবং কামচোর লেবারদের গ্যাঙ। পরিশ্রমী, তাগদদার মজুরদের নিয়ে, অফিসের কাছাকাছি সবচেয়ে ভালো কাজের সাইটগুলিতে প্রথমেই কাজ জুটিয়ে নিত --- সত্যনারায়ণ সাহু, টুনি সর্দার, সুবাস বোসের মত সিনিয়ার টাফেরা। উপন্যাস রচয়িতার ভাগ্যে সাইট ম্যানেজার সমীর ঘোষের কৃপা মিলতো বেলা এগারোটার পর। অবশ্য কারখানার গেটে ঢুকতে হত সকাল সাড়ে সাতটায়।
অবশ্য এ অবস্থা বদলে গিয়েছিলো কিছু দিনের মধ্যে। তিনমাসের অস্থায়ী চাকরীর এক্সটেনশন হয়েছিল এক বছর। সুপারভাইজের কাজে সিনিয়ন স্টাফেরা খুব দ্রুত পিছনে পড়েছিল। তারপর একে একে কেটে গিয়েছিল একুশ বছর। কিন্তু কারখানার গেটগুলির নিচের স্নায়ুবিবশকারী অন্ধকার জগত, স্টিলপ্ল্যান্টের আনাচকানাচের গোপন সাইডিং সমূহের শীত গ্রীষ্মের বাতাবরণ আর জগদীশ ভুঁইঞা, অনন্তসর্দার, পদু গোপ, কালমণি কিম্বা সরস্বতীগ্যাঙের মজুরদের মত খাশুকা নাঙা ভাঙা মরচে পড়া মানুষদের জীবনযাপনের সিসমোগ্রাফ আমার পিছু ছাড়েনি।
আজ প্রায় এক যুগের বেশি সময় বিচ্ছেদ ঘটেছে। কিন্তু আমি জানি সেই অরব প্রাগৈতিহাসিক অন্ধকার আজও সামান্য কমেনি। লুপ্ত প্রজাতির মতো হারিয়ে গেছে তারা--- কিন্তু এখনো তাদের মত একটি প্রচ্ছন্ন জীবনধারা, এখানে কোথাও না কোথাও অনিঃশ্চল প্রবাহিত হয়ে চলেছে।
যে কোন ঘটনার তিনটি স্বতন্ত্র ভাঁজ থাকে। প্রথম ভাঁজটি বক্তার অর্থাৎ যিনি ঘটনার কথা বলেছেন অথবা লিখছেন। দ্বিতীয় ভাঁজটি শ্রোতা কিম্বা পাঠকের ---ঘটনার প্রক্ষেপ তার মনে একটি নতুন ধারণার জন্ম দিচ্ছে। আর তৃতীয় ভাঁজটি সেই সব মৃত মানুষদের নিয়ে যারা একদা ঘটনাসমূহের সঙ্গে সংশ্লিষ্টছিল। তাদের ঘিরে যে কুয়াশার বলয়, প্রশ্ন, তা কি কোনদিন সত্যের কাছে পৌঁছতে পারবে?
আসলে সমস্ত ঘটনার মধ্যে থাকে অসংখ্য ফাঁক। যে সংকীর্ণ ফাঁকের ভিতর দিয়ে অন্ধকার চিনে স্মৃতির গহ্বরে এসে পড়ে শেষ গোধুলি সূর্যাস্তের বাঁকা আলো। যে আলোর বিভান্বিত হয়ে ভাসতে থাকে চূর্ণ চূর্ণ অসংখ্য ত্রসরেণু। আলো নিভে গেলে অরব অন্ধকারের মধ্যেও যারা--- বাতাসে ভাসে, ভেসে থাকে--- অথচ মানুষের দৃষ্টির খরতা তখন তার নাগাল পায় না। সত্য বাতাসে ভাসনাম

ত্রসরেণুর মত। যা সবসময় আমাদের চারপাসে বাস্তবহয়ে ঘিরে থাকে, অথচ দৃশ্যমান সময়টুকু আমরা তাকে বাস্তবতা বলে চিহ্নিতকরি। বাকী সময় সে সম্পর্কে নীরব থেকে যাই। কেননা নীরবতা হয় অন্ধকারকে অস্বীকার করার এক অ-বর্বর আশ্চর্য উপায়।

ভুঁইয়াদের সম্পর্কিত এযাবৎ
ছিন্ন বিচ্ছিন্ন ডেটা সমূহ ।।

'কাককৃষ্ণঃ হ্রস্বাঙ্গ হ্রস্ববাহু মহাহনু, হ্রস্বপাণি নিম্ননাসাগ্র রক্তাক্ষ তাম্রমূর্ধজ' --ভাগবত পুরাণের রচয়িতা এভাবে দেখেছিলেন ভারতবর্ষের আদি বাসিন্দাদের। সবদিক থেকে যারা হ্রস্ব, হ্রস্ব অর্থে ক্ষুদ্র, আর ক্ষুদ্র মানে ছোট। শুধু শরীরেই ছোট নয়, এরা ছোট জাতে, ছোট ভাষায়, ছোট কৃষ্টিতে, ছোট জীবনযাপনে। পরবর্তী কালের সমাজের অনুশাসনে যারা এভাবে ক্রমশঃ ছোট হ'তে হ'তে বিলীন হয়ে গেল -- পাহাড়ে, কন্দরে, অরণ্যে। সময় যাদের চিহ্নিত করল পাহাড়িয়া, অসভ্য, বুনো শিরোপায়। তারপর সাম্রাজ্যবাদীরা এসে যাদের বলল 'স্যাভেজ' অর্থাৎ বর্বর, যাদের জীবনযাত্রায় কোনদিন এনলাইটমেন্টের কোন দিশা জেগে উঠল না। ভুঁইয়ারা এই 'সাভেজদের' বংশধর,তথাক থিত হেজেমনিদের শোণিত ঔদ্ধত্য কিম্বা গাত্র বর্ণের অহংকার কোনদিন যাদের মানুষ বলে গ্রাহ্য করেনি।
ভুঁইয়ারা আসলে প্রোটো - অস্ট্রেলয়েড নৃতাত্বিক বর্গের মানুষ। আইকস্টেট যে বংশকে 'বেদ্দীয়' নাম দিয়েছেন, ডঃ বিরজাশঙ্কর গুহ তাদের বলেছেন প্রায় - অস্ট্রেলিয় বা প্রোট - অস্টোলয়েড বংশ। সমগ্র মধ্য ও দক্ষিণ ভারত ছাড়াও পশ্চিমভারত এবং গঙ্গা উপত্যকার অধিবাসী নিম্নশ্রেণীর হিন্দুরাও এই প্রায় - অস্টেলিয় গোষ্ঠীর মানুষ। ভীল কোল, বড়গা, কোরিয়া, মারোয়ার, মুণ্ডা, ভুমিজ, মাল পাহাড়িয়া এরা প্রত্যেকে প্রায় অস্ট্রেলিয়া শাখার অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু এই আরণ্য সন্তানের উত্তরাধিকারের শিকল বহুকাল ভুঁইয়াদের জীবন থেকে ছিঁড়ে গেছে। উদ্বাস্তু মজুর হয়ে বছরের পর বছর ঘুরতে ঘুরতে ভুঁইয়ারা আজ হিন্দু সমাজের একটি অপভ্রংশ অংশ মাত্র।
যদিও নৃতত্ববিদ্ এবং ভাষা বিজ্ঞানীরা মনে করেন, হিন্দীভাষা অধ্যুষিত অঞ্চলের ধাঙ্গড়দের মতই ভুঁইয়ারা কোল সম্প্রদায় থেকে উদ্ভুত, আদিবাসী জনগোষ্ঠীর এক বিচ্ছিন্ন অংশ; তথাপি ভুঁইয়াদের জীবন না আছে সেই আদিবাসী গোষ্ঠীর মত ভুঁইয়ারা এখন হিন্দি ভাষায় কথা বলতে অভ্যস্ত। ভুঁইয়াদের হিন্দি তা আদৌ চলিত কিম্বা আঞ্চলিক হিন্দিভাষার কোন প্রতিস্বর নয়, বরং তা হ'ল মগধি আর্য ভাষার এক বিকৃত রূপ। ফলে ভুঁইয়াদের জীবনে শুধুমাত্র জাতি সংযোগই ছিন্ন হয়নি, তাদের ভাষা সংযোগও হারিয়ে গেছে অনেক অনেক বছর।
একদা ভুঁইয়াদের অধিকাংশ গোষ্ঠী ওড়িশার করদ রাজ্যগুলিতে বাস করত। ১৯৩১ সালের আদমসুমারীর রিপোর্ট অনুযায়ী আমরা দেখতে পাচ্ছি গয়া, ভাগলপুর, সাঁওতাল পরগণা, হাজারিবাগ, পালামৌ, মানভুম সহ উড়িষ্যার রাজ্যগুলিতে মোট ৬,২৫,৮২৪ জন ভুঁইয়া বসবাস করতো। ঐ সেন্সাস রিপোর্টেই আমরা দেখতে পাচ্ছি, বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের তৎকালীন দু'টি জেলায় --- বর্ধমান এবং মেদিনীপুরে ভুঁইয়াদের বসতি ছিল। ঐ রিপোর্টে মেদেনীপুরে ভুঁইয়াদের জনসংখ্যা ১৪৭২৬ জন আর ৯৯৮০ জন ভুঁইয়ার খোঁজ পাচ্ছি বর্ধমান জেলার বাসিন্দা হিসাবে আমাদের কাহিনীর জগদীশ ভুঁইয়ার দলের মেয়ে - মরদরা নিঃসন্দেহে ঐ সরকারী লোকগণনা মধ্যে অঙ্গীভূত হয়েছিল। সংস্কৃতির দিক থেকে সমস্ত ভুঁইয়া সমাজ একস্তরে নেই। কেওনঝোড়ের পাহাড়ি ভুঁইয়ারা যেমন এক আদিম জীবন যাপনে অভ্যস্ত, ঠিক তেমনি গাঙ্গপুর বা ইংরেজ শাসনাধীন কয়েকটি স্টেটের ভুঁইয়ারা প্রাক্ স্বাধীনতা আমলে নিজেদের আধুনিক হিন্দু সমাজের অংশ বলে মনে করত। এইসব অঞ্চলের জোত সম্পন্ন ভুঁইয়ারা, যারা তাদের সমাজে নেতৃস্থানীয় সর্দার বলে স্বীকৃত, তারা নিজেদের রাজপুত বলে পরিচয় দেয় এবং সমাজের কাছে সে মর্যাদা দাবিও করে।
নৃতাত্বিকদের অভিমতকে যদি অস্বীকার না করি, ধরে নিই ভুঁইয়ারা ভারতীয় অরণ্যচারী স্বাধীন আদিবাসীজনগোষ্ঠীর একটি বিচ্ছিন্ন ভাসমান অংশ, আমরা আশ্চর্যভাবে লক্ষ্য করবো --- আমাদের কাহিনীর ভুঁইয়ারা যখন ১৮৫০ সাল থেকে পশ্চিম বর্ধমানের খনি থেকে খনিতে লোডিং কিংবা টালোয়ান হয়ে রক্ত উগরে দিচ্ছে, কুলটিতেলোহা কারখানায় ফার্নেসের জঠরের আগুন জ্বালিয়ে রাখছে দিনের পর দিন, রেললাইনের সীমারেখা বাহিয়ে চলেছে হাওড়া থেকে রাণীগঞ্জ, রাণীগঞ্জ থেকে আসানসোল হয়ে সীতারামপুর পেরিয়ে যশিডি, গিরিডি, মধুপুরের দিকে; রেলইয়ার্ডকে প্রসারিত করছে খনি থেকে খনিতে - তখন তাদের ছিন্ন বংশলতিকার এটি অংশ একের পর এক বিদ্রোহ নাস্তানাবুদ করে চলেছে ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রশক্তিকে, অত্যাচারী রাজলোলুপ দেশীয় ভূস্বামীদের।
১৭৮৯ সাল থেকে বারে বারে এক অনিবার্য ফিরে আসা প্রাচীন লোকগীতির ধ্রুবপদের মতো ১৮৩১ সালের বিখ্যাত কোল - বিদ্রোহ পার হয়ে, ১৮৫৫ সালে জেগে ওঠা 'হুল' অবধি যে অগ্নিদাহ - তার সামান্য তাপও কিএই পরিযায়ী জনগোষ্ঠীর চামড়াকে সামান্য স্পর্শ দিয়ে যেতে পেরেছিল? আধুনিক বায়োটেকনোলজির 'জিনোম' এর বিজ্ঞানভিত্তি কি, এই নীরব, হিমশীতল রক্তস্রোতে একবারের জন্যও কি সামান্য কম্পন তুলতে পারে নি?

পারে নি, কেননা শিল্প বিপ্লবের চোয়ালের বিষদাঁত সেদিন আটকে দিয়েছিল ভুঁইয়াদের যাবতীয় অস্তিত্বকে। তারপর দীর্ঘ দেড়শ বছর এমন কোন স্বপ্ন, ঝড়ো বাতাস, প্রাণ কাঁপানো ডাক --- তাদের চারপাশে চকিতে একবারের জন্যও জেগে ওঠেনি, যাতে তারা তাদের জং পড়া শিরায় শিরায় আদিম রক্তস্রোতের উষ্ণ প্রবাহ অনুভব করে নিতে পারে? তাদের বোবা কণ্ঠস্বরে ছিট্‌কে নামে নিসর্গ আলোড়িত করা শীত রাত্রির বুনো জানোয়ার তাড়ানোর প্রাগৈতিহাসিক সমবেত রণধ্বনি। প্রকৃতপক্ষে যা তারা হারিয়ে ফেলেছিল অনেক অনেক দিন আগে।

বিনির্মাণ / ২ ভারতবর্ষকে মানব মিলনের সাগরতীর বলে যত বেশি উচ্চকিত হই না কেন, এখনও কয়েককোটি আদিবাসীর জীবনয াপন আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়, বস্তুত ঐ মিলনের ধারণা কত বেশি কাল্পনিক এবং কষ্টকল্পিত। হাজার হাজার বছর ধরে আর্য ভারত এবং আদি ভারত এক আকাশের নিচে বাস করেও যোজন যোজন দূরত্বে রয়ে গেছে। শোণিত অথবা সংস্কৃতির কে ান সমন্বয় এই দুই বিপরীত মের সমাজের ভেতর ঘটেনি। বর্ণহিন্দু সমাজে এরা আজও অনাহুত, অবাঞ্ছিত অতিথি। ইস্পাত সভ্যতা যখন ক্রমশ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে জামশেদপুর, বার্ণপুর, কুলটিতে তখন সেই ভূমিখন্ডের পাশের শাল, মহুয়া, সেগুনের বনে বনে আ দিবাসী মানবপুত্র পাথরের কুঠার কিম্বা বাঁশের ধনুক কাঁধে নিয়ে প্রায় উলঙ্গ হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আজ যখন সারা দেশ জুড়ে আলে ার রোশনাই ছড়িয়ে দিচ্ছে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পের ফসলসমূহ --- বোকারো, ভিলাই, রকেল্লায়, দুর্গাপুরে --- তখনও ইস্পাত সভ্যতার পাশে প্রায় আদি প্রত্নযুগ এখনো টিকে আছে।

ঔপনিবেশিক বর্বরতা এবং যন্ত্রসভ্যতার চাহিদা তথাপি এদের নিজের মাটিতে টিকে থাকতে দেয় নি। প্রায় তিন শতাব্দীর সময়যানে ব ারবার এদের শ্রমশক্তিকে পন্যে পরিণত করার জন্য সামান্য অন্নসংস্থানের লোভ দেখিয়ে, এদের ঘরছাড়া দেশছাড়া শিকড় ছেঁড়া হয়ে যেতে বাধ্য করেছে। আসামের চা - বাগানে, দুর্গম পাহাড়ি অঞ্চলে, কয়লা আর খনিজ আকরিকের ভান্ডারগুলিতে গড়ে ওঠা নগরগুলির কলে - কারখানায়, ছলে বলে - কৌশলে বছরের পর বছর এদের পশুপালের মত তাড়িয়ে নিয়ে এসেছে, নিংড়ে নেওয়া হয়েছে, ছিবড়ে হয়ে মরে যেতে বাধ্য করা হয়েছে, বাংলা ভাষায় এসব বোঝাতে বেশ সুন্দর দুটি শব্দ রয়েছে--- পরিযায়ী এবং অভিবাসী।

অভিবাসন অর্থে ইমিগ্রেসন--- কিন্তু এই শব্দটির মধ্যে যে অর্থ সংকেত জেগে আছে তাতে এই শিকড়চ্যুত জনজাতিদের অস্তিত্বের সমস্যা স্পষ্ট হয় না। রাশিয়ার কিয়েভ নগরবাসী লেখক এ্যাসার গিনস্‌বার্গের 'অ্যাট দ্য ক্রশরোড' নামক গদ্য সংকলনটিতে এই জ াতীয় অভিবাসিত জনসমাজকে নিয়ে, তাদের যাপনের সমস্যাকে নিয়ে কিছু আলোচনা করা হয়েছে। যেখানে 'ডায়াস্পোরা' শব্দটির খোঁজ পাচ্ছি।

ডায়াস্পোরার ধারণাটি সাম্প্রতিক হলেও প্রাচীন ইতিহাসে ও সমাজতত্বের আলোচনায় শব্দটি জুড়ে আছে। গ্রীক ডিসপার্সঅর্থে ছড়িয়ে যাওয়া--- ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে বাধ্য হওয়া। অর্থাৎ ডিসপার্স থেকে ডায়াস্পোরিক। আমাদের উপন্যাসে বর্ণিত জনসমাজ - ভুঁইএাঁরাও সে অর্থে ইমিগ্রেটেড নয়, অবশ্য তারাও এই ডায়াস্পোরাজাতধারণার ফসল, বছরের পর বছর তারা অন্নসংস্থানের জন্য, দৈনন্দিন খুদ কুঁড়োর জন্যে ছুটে যেতে বাধ্য হয়েছিল এক ভুগোল থেকে অন্য ভৌগোলিক সীমারেখায়। যে সামাজিকতার চাপে তাদের ভাষা, কৃষ্টি, যাপন, খাদ্য - অভ্যাস, সংস্কার সব কিছু ছিড়ে খুঁড়ে যাচ্ছিল। তাদের মধ্যে গড়ে উঠেছিল একটি সংকর প্রতিবেশ। তারা ক্রমশঃ হারিয়েফেলছিল জাতিসত্তা, স্মৃতিভার এবং ভাষা - চেতনা। সব হারিয়ে তাদের জীবন ক্রমশ হয়ে উঠেছিল একটি আইডেনটিটিহীন প্রবাহের মত । যে প্রবাহে কোন ধারা সৃষ্টি করে না। যা আস্তে আস্তে শীর্ণ হয়। যে অভিজ্ঞতা সমূহের মধ্যে তঁ াদের হেঁটে যেতে বাধ্য করা হয় তা আদৌ আকর্ষণীয় নয় বরং নির্মম এবং ভয়াবহ। কেননা এই ভয়াবহতার মধ্যে জেগে থাকে ক্রম াগত চ্যুত হওয়া, শিকড় ছিঁড়ে যাওয়া, উপড়ে পড়ার, ছিন্নমূল হয়ে যাওয়ার, ক্রমশ হারিয়ে যাওয়ার এক পার্থিব বেদনা। বস্তুত সে বেদনাও ডায়াস্পোরিক।

ভুঁইএাঁদের
আদি ইতিহাস ।।

১৭৭৪ সালে ইস্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর জন সামনার এবং এস. জে. হিটলী নামে দুই ইংরেজ বণিকের হাতদিয়েই বর্ধমান জেলার এই পশ্চিমভাগে কয়লাখনির গোড়াপত্তন। সে সময় মাটির অন্ধকার সুড়ঙ্গ থেকে কয়লা তুলে আনার একমাত্র ভরসা মানুষের পেশীশক্তি। কারণ পেশীর প্রতিযোগী যন্ত্র তখন এতো উন্নত ছিল না। সুতরাং খনি চালাতে প্রথম দরকার হত মানুষ এমন মানুষ য াদের দেশ মাটির পিছু - টান নেই, শিকড় নেই, কোথাও জড়িয়ে থাকার আকাঙ্ক্ষা নেই ---- অথচ পেটে রয়েছে আজন্মকাল সঞ্চিত ক্ষুধার আগুনের তীব্র দহন। সেই দহনের তাপ জুড়াতে সহজে তাকে নামিয়ে দেওয়া যায় মাটির নীচের মৃত্যুসমীপ অন্ধকারে। তো সেই কয়লাখনির মজুর যোগাড়ের জন্য গড়ে উঠেছিল হাজারো পন্থা। স্থানীয় লোকজনেরা প্রথম থেকে অনাসক্তি দেখিয়েছে কয়লাখনির কাজে। কেননা একমাত্র এই মানুষেরা প্রত্যক্ষদর্শী ছিলো কি ভাবে কয়লাখনিরঅন্ধকারে ইনসান জানোয়ারে পরিণত

হয়। তাছাড়া সে যুগে কৃষিতে যে আয় করা সম্ভব হত, তার পাশে খনির চাকরী কোনোভাবে আকর্ষণীয় ছিল না
সুতরাং খনি মালিকদের কাছে প্রয়োজনীয় হয়ে উঠলো সেই সব লোকজনেরা। যারা দূর প্রদেশ থেকে ভূমিহীন কৃষি মজুরকে টাকার স্বপ্ন দেখিয়ে, মাস মাহিনার লোভ দেখিয়ে, পেট ভর্তি গরম ভাত আর গোলা টির উষ্ণতম আস্বাদের কাছে পৌঁছানো সহজতম রাস্তার তল্লাস দিয়ে দলকে দল খনির সুড়ঙ্গে ঢুকিয়ে ফেলবে।
সেই গরম ভাত আর গোলা টির টানে আরা, বালিয়া, ছাপরা, মতিহারী, দেওরিয়া, বস্তি, জেমুই, মুঙ্গের, লক্ষ্মীসরাই, জৌনপুর, ভাগলপুর, গোরখপুর, বিলাসপুর,, রায়পুর, পুরী, গঞ্জাম, বাস্তার, আজমগর, রক্সৌল, কাঠমুণ্ডু কাঁহা কাঁহা থেকে মানুষ এসে জুটেছিল পশ্চিম বর্ধমানের খনি অঞ্চলে। এই প্রবাহের মধ্যেই ১৮৪১ সালে জগদীশ ভুঁইঞার বাপের বাপের বাপ লছমন ভুঁইঞা এসে উঠেছিল তার দলবল নিয়ে চিনাকুড়ি কয়লা খাদানে।
১৮৩৬ সালে ৯ই জানুয়ারী সংখ্যা 'সমাচার দর্পণ' থেকে জানা যায়, সেই বছরেই মাত্র সত্তর হাজার টাকায় দ্বারকানাথ রানীগঞ্জ কয়লাখনি কিনে নেন। অবশ্য এর আগে ইংরাজ খনি মালিক বেটস সাহেবের কাছ থেকে চিনাকুড়ি খনি কিনেছিলেন প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর। এই বাঙলী মালিকটি সম্পর্কে লছমন অথবা তার ছেলে দামু ভুঁইঞা মৃত্যুর আগে পর্যন্ত তেমন কিছু জানতে পারে নি। এমন কি বাংলাদেশের উদীয়মান নব্য বুর্জোয়াদের উত্থান সম্পর্কেও সামান্য কোন ধারণা সে যুগেই ভুঁইঞাদের ছিল না।
যদিও প্রিন্স দ্বারকানাথ চিনাকুড়ি খনিতে স্টীম ইঞ্জিনের ব্যবহার শু করেন, যাতে খনিগর্ভের জল সহজে বাইরে বের করা যায়। কোন অযাচিত দুর্ঘটনার ফলে উৎপাদন মার না খায়।
অথচ ১৮৪৫ সালে লছমন ভুঁইঞা ঐ চিনাকুড়ি খাদেই ব্লাস্টিংদের পর ধবসে পড়া কয়লার চাঙড়ে খুলিফেটে মরল।। আর তার ছেলে দামু আরও তেত্রিশ বছৰ পর ১৯৭৮ সালে চিনাকুড়ি খাদানের ভিতর জল ঢোকার ফলে দমবন্ধ ইঁদুরের মতো মরে যেতে বাধ্য হল। সাতবছর পর ঐ চিনাকুড়িতেই ফেটে মরলো দামু। তখন তার ছেলেছিপে ভুঁইঞার বয়স তিন বছর ছয়মাস।
ছিপের নানা, দামুরশ্বশুর করমচাঁদ ভুঁইঞা ১৮৭২ সালে রাজপুত ছত্রীদের তাড়া খেয়ে মুঙ্গেরের আসরগঞ্জ থানার লালনপুর গাঁ ছেড়ে হাজির হয়েছিল কুলডিহিতে। তখন সেখানে সবে গড়ে উঠেছে নতুন লোহার কারখানা। জেমস এরস্কিন সাহেবের সেই গড়ে ওঠা নতুন কারখানায় লোহা ঢালাইয়ের ফার্নেসে মজুর হয়ে ঢুকে পড়ল করমচাঁদ। দামু মরতে ছিপেকে সঙ্গে নিয়ে দামুর সদ্য বিধবা বউ মালতি ভুঁইঞা এসে উঠলো বাপের ঘরে, কারখানার পাশের শিয়ালডাঙার শ্রমিক ধাওড়ায়।
১৮৬৫ সালের পর থেকে কুলডিহি গাঁ আস্তে আস্তে কুলটি শহরে বদলে গেল। ভারী জববরদস্ত হয়ে উঠলো কারখানা। রাণীতলায় জমে উঠলো বাজার দোকান। বাবুদের জন্য রাতারাতি তৈরী হল পাকা মকান। কোয়ার্টারে পর কোয়ার্টার । ছিপে ভুঁইঞার মা মালতি কয়েক বছর পর ফের সাদির পিড়িতে বসল। কিন্তু এবার সে পাত্র নির্বাচনে কোন ভুল করেনি। আর কয়লা খনির অন্ধকার ভবিষ্যতকে স্বীকার করে নিতে সে রাজি নয়। সুতরাং মুসববরভুঁইঞাকে স্বয়ংবরে নির্বাচন করার ব্যাপারে মালতি সামান্য দ্বিধাও করেনি।
কিছুদনি হল সবে রেললাইন চালু হয়েছে। মুসববর রেল কোম্পানীর লাইন মেরামতির মজুর। সাদির পরমুসববরের সাথে মালতি চলে গেল অণ্ডাল জংশনে। ছিপের বয়স তখন ছয় বছর কয়েক মাস। ছিপ থেকে গেল নানার বাড়ি কুলটির লেবার ঝোপড়ায়। কারখানার পাশেই শৈশব পেরিয়ে, তাণ্য টপকে জোয়ান হয়ে উঠল ছিপে। তাজা মরদ। আর তখনই সে বোধ হয় রক্তে শুনতে পেয়েছিল কয়লা খনির ডাক। খুব ছোট থেকেই সে শুনেছিল বাপ আর ঠাকুর্দার শোচনীয় মৃত্যুর কথা। কিন্তু সেই না-- দেখা দুটি মৃত্যুর কাহিনী কোনদিন তার মনের কোন দাগ কাটেনি।

জোয়ান বয়েসে ছিপের দোস্তি হয়ে গেল বুড়মন নুনিয়ার সাথে। বুড়মনেরশ্বশুরাল ঐ কুলটি লেবার ঝোপড়াতে। বুড়মানের সাথে তার দোস্তির দুটি আকর্ষণ বিন্দু। এক দিশি মদের অফুরন্ত পানের সুযোগ এবং দু--- বড়মানের ষোড়শী কন্যা জসেরির (জয়শ্রী) প্রতি এক দুর্নিবার যৌন আকর্ষণ। এই দুটি অপ্রতিবোধ্য আকর্ষণের টান, ভাবীশ্বশুর আর দামাদকে এক অচ্ছেদ্য বুননে জড়িয়ে দিল।
বুড়েমনের সাথে ছিপের খুব একটা ফারাক ছিল না। তাছাড়া বুড়মন বুঝেছিল ওই যুবার হাতে তার একমাত্র লেড়কির ভবিষ্যৎ লগ্ন হয়ে আছে। সুতরাং সে জীবিকার পথ বাতলায় ছিপেকে। বোঝায় -- একমাত্র বুদ্ধুরাইমেহনত করে টিকে থাকে। সমজদার আদমীর জুন্য দুনিয়ার রূপেইয়া কামাইয়ের হাজার রাস্তা খোলা।
বুড়মন নিজের প্রশস্ত বুকে চাপড় মেরে বলতো -- হাঁ দেখো হামকো। হাম নে না কারখানিয়া মে খাটতে, না খাদান মে। হাম হ্যায় তাগাড়ে সর্দার। হপ্তা ভর কমিশন কামাতে হ্যায় চাল্লিশ - পচাশ পেয়া। আর দেখো শালে বুদ্ধুলোগ, কো, খাটতে খাটতে হাড্ডি কালা হো গয়া। পত্তা ভরক কামাই ছে টাকা আট আনা ছে পাই।
তারপর চুপিচুপি বলতো --- শুনো। ছোনো এ শালে কুলটি। চলো হামারে সাথ। খাসকেন্দা খাদান মে বহুত তাগড়া কাম শু হুয়া। হাম তুম্কো ভি তাগাড়ে সর্দার বানা দুঙ্গা।

তো কথা রেখেছিল বুড়মন নুনিয়া। হোক বেজাত, তবু সে নির্দ্বিধায় জসেরির সাথে একসঙ্গে শোবার অধিকার দিয়েছিল ছিপেকে। আর তাকে বাতলে দিয়েছিল শরীর না খাটিয়ে নির্বিবাদে পেইয়া কামাইয়ের রাস্তা।

বীরভূম জেলার লাভপুর গ্রাম থেকে কয়লা ব্যবসা করতে এসেছিল যাদবলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। যাদবলালের জীবন শু বেঙ্গল কোল কোম্পানীর গোমস্তার চাকরী দিয়ে। ঐ চাকরী আর অন্যান্য নানা ফিকিরে জমানো টাকায় তিনি বেশ খানিকটা জমি কিনে ফেললেন। সেই জমির দশ হাত নিয়ে ঘুমিয়ে ছিল কয়লার স্তর। যাদবলাল মাটিখুঁড়ে তুলে আনলেন কালো সোনা।
সেই লাভের ভাগ দিয়ে তার ভাগ্যে জুটল আরও তিনটি সিঁড়ি খাদান। ডালমিয়া আর হরিপুরের কাছে দু'টি খাদান, তা থেকে ঐ শতকে বিস্তর উপার্জন করেছিলেন যাদবলাল। আর এই যাদবলালের জামাই মুণবাবু, মনীন্দ্রলাল মুখোপাধ্যায় কয়লাখনির ইতিহ াসে একজন সুনামখ্যাত স্বনামধন্য পুষ।
ছিপে যখন ভর সন্ধায় দু'এক পাত্র মদিরা পান করে জসেরির হাত ধরে কুলটির সদ্য গজিয়ে ওঠা রেললাইন ছাড়িয়ে, শিয়ালডাঙা গ্রাম পার হয়ে মুক্ত প্রান্তরে কোন কোন দিন জসেরির ওপর বায়োলজি শিক্ষার প্রাকটিক্যাল ক্লাসে হাজিরা দিচ্ছে, তখন কোন একদিন মুণিবাবু যাদবলালের জামাই হয়ে গেল। আর সেই সূত্রেই খাসকেন্দা কলিয়ারি তার মালিকানার বিবাহের যৌতুক হিসাবে ভেট হয়ে এল।
ভাবীশ্বশুর বুড়মন নুনিয়ার হাত ধরে একদিন এই খাসকেন্দা খনিতে লেবার যোগাড়ের কাজে লেগে গেলে দামু ভুঁইঞার ছেলে ছিপে ভুঁইঞা। পূর্বপুষ তার শিরায় শিরায় রোপণ করে গিয়েছিল কয়লার বিষ ফের সাতাশ সাল বাদ সেই বিষ আবার ছোবল দিল ছিপের শরীরে। দৌলত না পেলেও দুলহনিয়া মিলে গেল সহজে। অবশ্য কথা মত, মেহন্নত বিনা কামাই করার বন্দোবস্তও পাক্কা করে দিয়েছিলো বুড়মন তার দামাদকে।

১৮৭২ সালে রাণীগঞ্জ মহাকুমা শহর হওয়ার ফলে এক ভারি জবরদস্ত টাউন হয়ে গিয়েছিল। চমক বাড়ছিল এই গঞ্জ শহরের, প াশে দামোদর নদ। যেখানে বজরাভর্তি কালো সোনা দামোদরের জলের স্পন্দন তুলে পাড়িদিচ্ছে কলকাতায়। প্রিন্স দ্বারকানাথের এগরা গ্রামের কাছারি বাড়ি তখন আর অ্যাণ্ড টেগোর কোম্পানীর সদর দপ্তর। আমলা, ফড়ে, সাহেব, দালাল, ইঞ্জিনিয়ার, ম াইনিং সর্দার, বেনিয়া আর কুলি সর্দারদের ভীড়ে গিস্ গিস্ রাতদিন। কয়লা নিয়ে তখন রাণীগঞ্জ - আসানসোল এলাকা সারা ভ ারতের গড়ে উঠা নতুন নিউ ক্যাসেল। ১৯০৬, রাণীগঞ্জের বদলে মহকুমা শহর সরে গেল আসানসোলে অবশ্য এর অনেকদিন অ াগে ১৮৯১ সালে আসানসোলের শহর দেখভাল করার জন্য গড়ে উঠেছিল আসানসোল পৌরসভা।
খাসকেন্দ কলিয়ারি এই দুই ভারি শহরের একবারে পাঁজরার কাছে। ফাল্গুন মাসে রাণীগঞ্জে দরগা শরীফেপীর বাবার মেলায় খ াসকেন্দ থেকে পায়দলে পৌঁছে যায় কয়লাখনির কুলি কামিনেরা। আর ঐ ১৯০৬ সালে থেকে ছিপে, জসেরি নুনিয়ার (তখন ভুঁইঞ া) সাদি সুদা মরদ, খাসকেন্দ কালিয়ারিতে মুণিবাবুদের জন্য মজুর যোগাড়ের কাজেশ্বশুর বুড়মনের অন্যতম সহযোগী।

কাঁহা কাঁহা মুলক থেকে বেবাক জানোয়ার ধরে আনার মতো আদমি তুলে নিয়ে আসতো তাগাড়ে সদতরো। ১৮৯০ সালে ইস্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে কোম্পানী তাদের রেল লাইন চালু করার পর ছোটনাগপুর থেকে, সাঁওতালপরগণা থেকে, হাজারিবাগ, মুঙ্গের, জেমুই, ঝাঁঝা, শিমূলতলা থেকে সাঁওতাল, কোরা, মুণ্ডা, ওঁরাওদের যেমন লালচ দেখিয়ে দলকে দখল খনিতে ভরে ফেলল তাগাড়ে সর্দারেরা, ঠিক তেমনি ভাবে ভুঁইঞা নুনিয়া, বেলদার, দুসাদ, চামার, খটওয়ালা -- বেবাক ভূমিহীন খেতমজুরদের ঝাঁকে ঝাঁকে ম াগী - মরদ, অন্ধকার গহন রহস্যময় খনিগর্ভের অতলে পৌঁছে দিয়েছিল হপ্তা ভর কমিশন আর বক্‌শিস আর বোতল ভর্তি দিশি মদের বিনিময়ে বুড়মন আর ছিপের মত সাব অলটার্নেরা। আজকের দুর্গাপুর স্টীল প্ল্যান্টের কোল সাইডের জগদীশ ভুঁইঞার দলের কিসান, সুখদেও, জহুরী, সুক্করদের পূর্বপুষেরা কেউ কেউ এই বুড়মন কিম্বা ছিপের মতো মানুষ ধরা শিকারীদের কথার ফাঁদে ধরা পড়েছিলো, ১৯০৬ থেকে ১৯১৫ সালের ভিতর।
এইসব মৃত ভুঁইঞাদের পূর্বপুষেরা তাদের পরবর্তী বংশধরদের দিয়েছিলো উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া ভূমিহীন কৃষকদের বঞ্চনা জড়িত হাহাকার। জন্মভূমির বাতাস তাদের দিয়েছিল ক্ষুধায় দগ্ধ ঝলসানো জীবনের সঙ্গতিহীন অবয়বহীনতা আর দেশ তাদের জন্য নির্দিষ্ট করে রেখেছিলো উচচবর্ণের ঘৃণা সহ পীড়নের যাবতীয় উপচার সুতরাং শহর থেকে আসা কোরা ধুতি পরিহিত আর রঙিন গামছা মাথায় জড়ানো ছিপে ভুঁইঞারা যখন তাদের কয়লা খাদানের রঙিন স্বপ্নে বুঁদ করে দিয়েছিল তখন জন্ম ভিটের বন্ধন ছিঁড়ে যেতে তাদের সামান্যও দ্বিধা জাগেনি। জেগে ওঠার কোন সম্ভাবনাও ছিলো না।
১৯১৫ সাল অবধি এভাবেই ৫১, ৪৭৭ জন নারী ও পুষ মজুরের মধ্যে শতকরা ৬০ জনই নেমে গেল কয়লাখনির আঁধার গহ্বরে ম ালকাটরার ভূমিকায় অথবা কয়লার টগাড়ী ঠেলে টালোয়ানের কাজে। বাকিরা মাটির উপরে, কয়লা গাড়ি বোঝাইয়ের কাজে,

বয়লার ঘরে জ্বালানী যোগানের কাজে যোগ দিল অথবা কলিয়ারির এজেন্টের অফিসের পাশে কামারশালায় মজুর বনে গেল। ছিপে ভুঁইঞারা দলের লোকজন প্রধানত কয়লায় ওয়াগন বোঝাইয়ের কাজ করত।
তখন রেলপথ বাড়তে বাড়তে ঢুকে পড়েছে খনিগুলির ভিতরেও। কলিয়ারির পাশে রেলওয়ে সাইডিং। সকালবেলায় দাড়িয়ে থাকে সার বন্দী খালি রেল ওয়াগান। ময়লা বিবর্ণ ছেঁড়া কাপড় জড়ানো ভুঁইঞা কুলি কামিনেরা সকাল থেকেই সেই শূন্যগর্ভ রেল ওয়াগন কাচা কয়লায় ভরতে শু করে। পুষেরা বেলচার সাহায্য বেতের ঝোড়ায় কয়লা ভর্তি করে আর কামিনেরা সেই ঝোড়া মাথায় তুলে নেয়, তা তুলে দিতে সাহায্য করে সহকর্মী পুষটি,প্রায় ক্ষেত্রে যে ঐ নারী শ্রমিকটির সন্তানদের পিতা। এক একটি ঝোড়া প্রায় এক মন কয়লায় ভরে ওঠে। অনায়াসেসে ভার মাথায় নিয়ে ভুঁইঞা কামিন লম্বা পাটায় পা রেখে উঠে যায় পনের ফুট উঁচুতে রেল ওয়াগনের উপরে। শূন্যগর্ভ ওয়াগন দ্রুত ভরে ওঠে কয়লায়। দূরে ছাতা মাথায় দাঁড়িয়ে থাকে লোডিং সুপারভাইজার। কুলি কামিনেরা বলে নুটিং মুন্সী। মুন্সীর দু'ধার বেয়ে পানের লালা রং পড়িয়ে নামে।
মাঝে মাঝে কামিনদের পাশে দাঁড়িয়ে সে ছুঁড়ে দেয় দু'একটি স্থূল রসিকতা। কামিনেরা সে সব শুনে মুচ্‌কিহাসে। ম্লান আলোর মতো সেই হাসি। কাজ থামিয়ে কয়লার স্তূপের উপরে উবু হয়ে বসে ঘর্মাত্ত লোডিং কুলিরা। কয়লায় কালো, কড়া পড়া, খসখসে হাতের তালুতে তামাকপাতা আর চুন মিশিয়ে বুড়ো আঙুল দিয়ে ডলতে থাকে। খৈনি বানায়। হাতের তালুর থাপ্পড় দিতে দিতে সুস্বাদু করে তুলতে চায় তামাক ও চুনের মিশ্রণ। বাতাসে রেণু রেণু হয়ে উড়তে থাকে তামাকের গুঁড়ো। মাল তৈরী হওয়ার পর পার্শ্ববর্তী সহকর্মীদের এক চিমটে করে ভাগ দেয় সে । এক হাতের আঙুল দিয়ে চেপে নীচের ঠোঁট টেনে নামিয়ে, অন্য হাতের কড়া পড়া বুড়ো আঙুলের আগায় খৈনি দাঁতের পাটির নীচে, ক্ষয় হয়ে যাওয়া মাড়ির পাশে রেখে দেয়। আবার লোডিং শু হয়। এভাবে রাত্রি এবং দিন। এভাবেই ঋতুচত্র। শীত, বর্ষা ও গ্রীষ্ম আবর্তিত হতে থাকে বছরের পর বছর।

বিমির্মাণ/ ৩ চিনাকুড়ি কলিয়ারির লছমন এবং দামু ভুঁইঞারা না চিনলেও, প্রিন্স দ্বারকানাথ ইতিহাস পুষ এবং একজন ভারতীয় কম্প্রাদোর বুর্জোয়া। যাঁর প্রাথমিক বিত্তসঞ্চয় বিদেশী বণিকের বাণিজ্য সহযোগী হিসাবে, প্রথম প্রথম ঘরে লক্ষী ঢুকেছে, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর ম্যানেজিং হাউসগুলির কৃপাবর্ষণ অর্থাৎ কমিশন রূপে--- কালত্রমে সেই লক্ষী পঁজিতে পরিণত হয়েছে --- যার সাহায্যে কেনা হয়েছে জমিদারি। (জমিদারি তাঁর কাছে ছিল ব্যবসা--- ব্যবসাদার সুলভ শৃঙ্খলায় তিনি জমিদারি পরিচালনা করতেন। তাঁর সেই পটুতার মধ্যে দয়া মায়া বদান্যতার কোন স্থান ছিল না। সূত্র ঃ পার্টনার ইন এ্যাম্পায়ার/ ব্লেয়ার বি. ক্লিং)
এছাড়াও অর্থলগ্নী করলে রেশম, চিনি, সোডার কুঠি, ব্যাঙ্কও বীমার ব্যবসায়। তার সাথে সাথে বানিয়েছিলেন ওয়টরউইচ্ নামক ৩৬৩ টনের একটি জাহাজ। (যে জাহাজের মাধ্যমে প্রিন্স দ্বারাকানাথ চীনদেশে অহিফেন সরবরাহ করতেন। পার্শী ব্যবসায়ী স্তমজী কেয়াসজীরও কয়েকটি জাহাজ ছিল। কলকাতা - ক্যান্টন, ক্যান্টন - কলকাতা দূর পাল্লার দৌড়ে কার জাহাজ জিতবে এ নিয়ে কলকাতার সে যুগের পাবলিক বাজি ধরত, কাতারে কাতারে ভীড় জমাত গঙ্গাতীরবর্তী জাহাজঘাটায় -- আর ব্লেয়ার ক্লিং লিখেছেন, 'ক্যান্টন থেকে কলকাতা অবধি দূরপাল্লারপ্রতিযোগিতায় ১৮৩৮ অব্দে ওয়াটারউইচ্ সকল প্রতিদ্বন্দ্বীকে হারিয়ে গিয়ে পঁচিশ দিনের দিন কলকাতা পৌঁছে রেকর্ড স্থাপন করেছিল।)
এছাড়াও কিনেছিলেন 'বাংলাদেশের সুপ্রাচীন এবং সুপ্রচুর জ্বালানির উৎস' রানীগঞ্জ অঞ্চলের কয়েকটি কয়লাখনি। (যে খনিগুলিতে যে যুগে শত শত লছমন এবং দামুর মত মানুষেরা কয়লার চাঙড়ে খুলি ফাটিয়ে অথবা খনিগর্ভে জলপ্লাবনের ফলে ইঁদুরের মতোশ্বাসরুদ্ধ হয়ে জান দিতে বাধ্য হয়েছিল।)
অথচ এ সব ছিল প্রিন্স দ্বারকানাথের সৌভাগ্যের ময়ূর পালক। মৃত্যুই সম্পদ আহরণ করে, সম্পদ অর্জনে সহায়তা করে, ইতিহাস পুষদের যুগপুষে রূপান্তরিত করে তোলে এবং ব্লেয়ার ক্লিং ছাড়াও কিশোরীচাঁদ মিত্র, ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কৃষ্ণ কৃপালনীদের মত মানুষদের প্রিন্সের জীবনী রচনার জন্য প্রাণিত করে।
ইতিহাসপুষ মারা গেলেন প্রবাসে। ১৯৪৫ - ৪৬ সালের শীতকালে, দীর্ঘকাল পারীশহরে অভিবাসিত হওয়ার সময়, তাঁর দোস্তি হয় তৎকালীন ফরাসীর সরকারের বৈদেশিক দপ্তরের এ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর অব প্রটোকল --- শ্রীযুত্ত কোৎফুইয়ে দ্য কোশের সঙ্গে। এই কোৎ তার আত্মস্মৃতি 'জুর্নাল দ্য অকোটজেনের' পঁচিশতম অধ্যায় প্রিন্সের সম্পর্কে কিছু কথা জানিয়েছেন। পরবর্তীকালে কোৎ এর লেখা সম্পর্কে বিতর্ক হলেও, প্রিন্স সম্পর্কে কোৎ লিখেছেন, ...'রাত ও দিনের মধ্যে কোন তফাত করতেন না। অত্যধিক রাত্রি জাগরণে শত্ত সমর্থ মানুষটি তাঁর শরীর স্বাস্থ্য খুইয়েছিলেন। অবশেষে লন্ডনের ক্ল্যারেনডন হোটেলে জেনারেল ও আবার উপস্থিতিতেই তাঁর মৃত্যু ঘটে ---শরীরে রত্ত প্রবিষ্ট করতে গিয়ে দেখা যায় তার ধমনীতে রত্ত নেই ---- আছে কেবল জল।'
কোৎ এর রচনা পাঠ করতে করতে জল সম্পর্কিত একটি আশর্চ্র সমীকরণ উপন্যাস লেখকের মনে জেগে ওঠে। প্রিন্স দ্বারকানাথের জাহাজ ওয়টরউইচ্ জলের উপর দিয়ে এগিয়ে চলেছে ক্যান্টনের দিকে, জাহাজের পেটভর্তি অহিফে ন --- অর্থাৎ চীনাদের মৃত্যুবীজ, যা আসলে প্রিন্স দ্বারকানাথের পুঁজি নির্মাণ। কলিয়ারির খনিগর্ভে জলস্রোতে ভেসে যাচ্ছে লছমন, দামুর মত সাবআলর্ট

ানরা, আর তখন নারায়ণকুড়ির ঘাট থেকে কয়লা ভর্তি দ্বারকানাথের বজরা পাড়ি দিচ্ছে দামোদরের জল চিরে, অন্ধকার গুহাযুগ থেকে ঔপনিবেশিক আলোকিত শহর কলকাতার দিকে। আর শেষে --- 'তার ধমনীতে রক্ত নেই --- আছে কোন জল......'
এই আশ্চর্য সমীকরণের উপান্তে মনে পড়ে যায়, ঈশ্বরের পৃথিবীতে বস্তুতই তিনভাগ জল....

অন্বেষা সাহিত্য থেকে সংগৃহীত